ধনী ও রানি

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লোকোত্তর জীবনলীলায় ধনী কামারনি ও রানি রাসমণি—এই দুই নারীর বিশেষ অবদান স্বীকার করে নিতেই হয়। দুজনেই অব্রাহ্মণ, প্রান্তিক বর্ণের। উভয়েই শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে বিশ্ব ইতিহাসের পাদপ্রদীপে আলোকিত হয়েছেন। উভয়েই অবতারের বিশেষ কৃপাপাত্রী। এ-ব্যতিরেকে দুজনের মধ্যে বৈসাদৃশ্যই অধিক। ধনী দরিদ্র কামারকন্যা, সমাজরীতি অনুযায়ী অতি শৈশবে বিবাহ দরিদ্র পরিবারেই; অল্পবয়সে পতিবিয়োগে অসহায় অবস্থায় পড়ে ধাত্রীমাতার কর্মগ্রহণে হয়তো বাধ্য হন। গ্রামেগঞ্জে অশিক্ষিতা দরিদ্র বিধবাদের ওই একটি কাজই তৎকালে সুলভ ছিল। রানি রাসমণি, অপরপক্ষে, মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা, বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ না পেলেও পিতার কাছে অক্ষর পরিচয় হয়েছিল, রামায়ণাদি গ্রন্থ কিছু পড়তে পারতেন। দৈব কৃপায় তাঁর বিবাহ হল কলকাতার একটি বিশেষ ধনবান পরিবারে, যাঁরা জানবাজারের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাড় পরিবার নামে বিশেষ খ্যাত। কামারকন্যা ধনী হৃদয়বত্তায় ধনী ছিলেন, বিত্তে নয়, কিন্তু রানি উভয় অর্থেই ধনী ছিলেন—বিত্তে ও চিত্তে।

ধনীর পারিবারিক জীবনের কথা বিশেষ জানা যায় না। তাঁর পিতামাতার কথা, তিনি সন্তানবতী ছিলেন কী না, এসব তথ্য বিশদে কোথাও পাওয়া যায় না। তবে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেন 'কড়ে রাঁড়ী' অর্থাৎ সন্তানহীনা বালবিধবারূপে তাঁকে বর্ণনা করেছেন। কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাসগৃহের কাছেই ধনীর বাড়ি ছিল। আশ্চর্যভাবেই এই নিম্নকুলোদ্ভব দরিদ্রা নারীটি ঠাকুরের মাতা চন্দ্রমণি দেবীর সখীর স্থান অধিকার করেছিলেন নিজ নির্মল চরিত্রগুণেই, সরল মধুর সেবাপরায়ণ ব্যবহারের জন্য। চন্দ্রমণি তাঁর মনের প্রাণের কথা ধনীর কাছে বলতেন, উভয়ের খুবই অন্তরঙ্গতা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই দিব্য আবির্ভাবক্ষণে, ব্রাহ্মমুহূর্তে, তিনিই ধাত্রীমাতার কাজটি করার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হন। চন্দ্রমণি দেবীর কাছে সেই সময়টিতে অনেক রমণীর আগমনের কথা জানা যায় না। শিশু জন্মাবার পর তার আকর্ষণে লাহা, পাইন প্রভৃতি পরিবারের কন্যারা তাকে দেখতে আসতেন—লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজী একথা জানিয়েছেন। ধনী প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, ওই শিশুকে পৃথিবীর আলোয় নিয়ে আসার ঐতিহাসিক ক্ষণটিতে শুধুমাত্র ধনীই ছিলেন চন্দ্রমণির পাশে। ক্ষুদিরাম

চট্টোপাধ্যায় গয়াধামে ভগবান বিষ্ণুর কাছ থেকে যে-দৈবনির্দেশ পেয়েছিলেন যে তিনি মায়িক শরীর অবলম্বনে তাঁর দরিদ্র কুটিরে আবির্ভূত হবেন, সেই শুভাগমনের শুভ সংবাদটি ধনীই প্রথম উৎকণ্ঠিত ক্ষুদিরামকে দিয়েছেন। ধনীই সকলকে জানিয়েছেন এই অভিনব বার্তাটি যে, শিশু জন্মাবার পরই মায়ের কাছ থেকে সরে হড়কে ঢেঁকিঘরের ছাইয়ের গাদায় চলে যায়; ধনীই ধূলিধূসরিত (নাকি বিভূতিভূষিত?) সেই অপূর্বদর্শন শিশুকে পরম মমতায় গাত্রমার্জনা করে মায়ের পাশে শায়িত করেন।

ধনীর সামনেই ঘটেছিল সেই অতিলৌকিক ঘটনাটি। তিনি চন্দ্রমণির সঙ্গে যুগীদের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় অকস্মাৎ চন্দ্রমণি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। চন্দ্রমণি দেবীর বয়ান অনুযায়ী আমরা জানতে পারি—যে-কথা তিনি তাঁর স্বামী ক্ষুদিরামকে, তিনি দীর্ঘকাল তীর্থভ্রমণ করে ফিরলে জানিয়েছিলেন—যুগীশ্বর শিবলিঙ্গ থেকে এক তীব্র জ্যোতি যেন ধেয়ে এল তাঁর দিকে এবং তাঁকে যেন গ্রাস করে ফেলল, তিনি সংজ্ঞা হারালেন; পরে তাঁর অনুভূতি হল যে ওই জ্যোতি যেন তাঁর উদরে প্রবেশ করেছে ও তাঁর গর্ভসঞ্চার হয়েছে। ওই বিশেষ ঘটনাটি ধনীর সামনে ঘটলেও তিনিও ওই জ্যোতি দর্শন করেছেন এমন কথা ধনী বলেননি, তবে চন্দ্রমণির শরীরের ক্ষেত্রে যে কিছু একটা ঘটে গেল তা তিনি বুঝলেন। অবশ্য এমনও অনুমিত হতে পারে, চন্দ্রমণি এমনই সরলপ্রাণা ছিলেন যে কিছু গোপন করে রাখা তাঁর স্বভাবে ছিল না এবং অন্যান্য ঘটনার মতন এটিও তিনি ধনীর কাছে ব্যক্ত করে থাকতে পারেন। সেইসময় ক্ষুদিরাম তীর্থদর্শন মানসে দীর্ঘকাল গৃহের বাইরে ছিলেন, গয়ায় তিনি অলৌকিকভাবে জ্ঞাত হন ভগবানের তাঁর গৃহে আগমনের কথা। গৃহে ফিরে শিবজ্যোতি দর্শন ও গর্ভসঞ্চারের কথা পত্নীর কাছে শুনে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসেন যে অচিরেই তিনি ওই অতিপ্রাকৃত সন্তানের জনক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। তিনিও চন্দ্রমণিকে গয়াধামের দর্শনের কথা জানান ও ওইকথা গোপন রাখতে বলেন। তবে সন্দেহ থেকেই যায় যে চন্দ্রমণি কি প্রিয় বান্ধবীর কাছে কিছুই বলেননি?

ধনী শিক্ষিতা না হলেও স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তায় স্থিত ছিলেন। চন্দ্রমণি পূর্বেও সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, কিন্তু এবারে তাঁর অপূর্ব দেহকান্তি সকলেই লক্ষ করেছেন, ধনীও ব্যতিক্রম নন। শুধু দৈহিক সৌন্দর্যই নয়, চন্দ্রমণির আচরণেরও কিছু পরিবর্তন নিত্যসঙ্গী ধনীর কাছে নতুন বলেই মনে হয়েছিল। দরিদ্র হলেও চন্দ্রমণি দানশীলা ছিলেন, ছিলেন স্নেহপরায়ণ ও মমতাময়ী। এখন যেন তাঁর সেই গুণগুলি অধিকমাত্রায় বর্ধিত হল; অতিথি, অভ্যাগত সকলের প্রতিই তাঁকে কোমল মাতৃভাব অবলম্বন করতে দেখা গেল। ধনী মনে মনে বোধহয় কিছু আভাস পাচ্ছিলেন অনাগত সন্তানটির বিষয়ে। চন্দ্রমণির যেসব অলৌকিক দর্শনাদি হত, ধনী সেসব শুনতেন। যেমন একদিন চন্দ্রমণি স্বপ্ন দেখেন, এক জ্যোতির্ময় দেবতা তাঁর শয্যায় শুয়ে আছেন। ঘুম ভেঙেও মনে হচ্ছিল তিনি শয্যাতেই আছেন। সকাল হলে ধনী, প্রসন্নময়ী প্রমুখ সখীকে ডাকিয়ে চন্দ্রমণি একথা জানালেন। সমাজসচেতন ধনী কিন্তু তাঁকে সাবধান করে দিলেন; যেন তিনি এসব কথা কারও কাছে না বলেন, কারণ তারা ক্ষুদিরামগৃহিণীর নিন্দা রটনা করতে পারে।

সন্তানজন্মের পরও এধরনের ঘটনা ঘটেছে। একদিন চন্দ্রমণি শিশুসন্তানকে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে দিয়ে কিছু কাজ করছেন বাইরে। কিছুক্ষণ পরে তাকে দেখতে এসে বিস্মিত হয়ে দেখেন শিশুর পরিবর্তে শুয়ে আছে এক দীর্ঘদেহী ব্যক্তি। চন্দ্রমণি ভয়ে দিশাহারা হয়ে স্বামীকে ডেকে যখন দেখাতে গেলেন, তখন পূর্বের সেই শিশুই শুয়ে আছে দেখলেন। ক্ষুদিরাম তাঁকে আশ্বস্ত করেন এই বলে

যে, এরকম অদ্ভুত দৃশ্য তিনি ওই শিশুকে ঘিরে অনেকেই দেখবেন, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর একবার চন্দ্রমণি শিশুকে কোলে নিতে গিয়ে অপারগ হয়ে বুঝলেন সে অত্যন্ত ভারি হয়ে গিয়েছে, পরক্ষণেই আবার পূর্বের মতনই হালকা বোধ হয়েছে। এসব কথা নিশ্চয়ই ধনীকে তিনি না বলে থাকেননি। চন্দ্রমণির তখন ধনী ছাড়া আর কোনও সমবয়সি সঙ্গী ছিল না। তিনি ধনীর কাছেই নিজের সরল, অকপট হৃদয়কে মেলে ধরেছিলেন, ধনীও সেই বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পেরে ধন্য হয়েছিলেন।

ধনী এও নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিলেন যে ছোট্ট গদাধর আর পাঁচটি শিশুর মতন নয়। সকলেই তাকে আন্তরিক ভালবাসে, তাকে একবার দেখতে ও কাছে পেতে চায়। লাহা, পাইনদের রক্ষণশীল কন্যারা অন্য কোনও গৃহে না গেলেও চন্দ্রমণির কাছে আসে ও গদাইকে একবার চোখের দেখায় তৃপ্ত হতে চায়। ওই দেববালককে নিজেদের তৈরি মিষ্টান্নাদি খাওয়ানোর জন্য তারা নিয়ে যায়। অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরামও ওইসব অব্রাহ্মণ পরিবারে খাদ্যগ্রহণে পুত্রকে বাধা দেন না। চিনু শাঁখারি সামাজিক অনুশাসন অগ্রাহ্য করে ব্রাহ্মণ সন্তান গদাধরকে তাঁর স্পর্শ করা মিষ্টান্ন খাইয়েছেন, যা সেকালে গ্রামীণ সমাজে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলেই গণ্য হত। আবার তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন যে গদাইকে পরে সকলে ভগবান বলে পুজো করবে; তখন তিনি থাকবেন না, তাই পূর্বেই পূজা নিবেদন করছেন। এসব খবর একই পল্লীতে থেকে ধনী কামারনির কি আর অজানা ছিল! পাড়ার যাত্রায় এই বালকটিকে শিবসজ্জায় সজ্জিত করলে তার শিবধ্যানে সমাধি হল যা যাত্রায় বিঘ্ন ঘটাল—তাও ধনীর চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য হয়েছিল নিশ্চয়ই। চন্দ্রমণির পূর্ব পূর্ব সন্তানদের বেলায় এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখা যায়নি, বা তাদের জন্য চন্দ্রমণিকে এমন সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেও দেখা যায়নি। অনুমান করতে বাধা নেই যে গদাধরের শৈশবের অলৌকিক ঘটনাবলি ধনীকে ভাবিয়েছিল ও ভরসা দিয়েছিল যে এই দেববালক—যাকে তিনি কোলেপিঠে করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন—সে নিশ্চয়ই তাঁর দুঃখময়, সর্বসুখবঞ্চিত নারীজীবনের এক সুখশান্তিময় গতিবিধান করতে পারবে।

যদিও আমরা জানি না ঠিক কবে ধনীর জীবনাবসান হয়, বা কতদিন তিনি কামারপুকুরে অবস্থান করেন, তবুও এটুকু নিশ্চিন্ত হয়ে বলা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণের উপনয়ন পর্যন্ত তিনি অবশ্যই সেখানে ছিলেন এবং তখনই তিনি তাঁর মনের সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন গদাধরের কাছে যে তিনিই ওই ব্রাহ্মণসন্তানকে প্রথম ভিক্ষা দেওয়ার অধিকার লাভ করবেন। গদাধরও তাতে সম্মতি দিয়েছেন। তখনকার দিনে গ্রামে গঞ্জে পুরাণাদির পাঠ বা কথকতা, যাত্রাপালার যথেষ্ট চল ছিল। এগুলিই গ্রামের মানুষদের—নারীপুরুষ সকলেরই একাধারে বিনোদন ও শিক্ষার উৎস ছিল। গদাধরও ছোটবেলায় সেইসব শুনতে যেতেন ও গৃহে ফিরে অন্যান্যদের কাছে—যাঁরা যেতে পারেননি তাঁদের কাছে—ওইসব পালা নকল করে শোনাতেন নিখুঁতভাবে। লাহা, পাইনদের বিধবা কন্যাদের কাছে গিয়েও অভিনয় করে তাঁদের আনন্দ দিতেন। আশা করাই যায় ধনীও সেইসব শুনতে যেতেন। পুরাণের ঘটনা অবলম্বনে ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপার কথা, তাঁর সমদর্শিতা, জাতিকুল বিচারহীনভাবে সকলকে আশ্রয়দান, অভয়দান—এসব কাহিনি ধনীর শোনা ছিল অনুমান করা যায়। আর এ থেকেই তাঁর ভরসা জন্মেছিল যে চন্দ্রমণির এই সন্তানটি যদি ঈশ্বরসত্তা বা তাঁর অংশ হন, তবে তিনিও জাতিকুলবর্ণ বিচার ব্যতিরেকেই শুধু ভক্তিবিশ্বাস-সেবা-সততা দেখেই ধনীকে কৃপা করবেন, অর্থাৎ তাঁর মনস্কামনা পূরণ

করবেন। আর যদি দেখা যায় তিনি সামাজিক নিষ্ঠুরপ্রথা—অস্পৃশ্যতা বা জাতিকুলের বিভেদকেই প্রাধান্য দিয়ে, হৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার অমর্যাদা করছেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর বা তাঁর অংশ নন। ধরে নেওয়া যায় যে এমন ভাবনা থেকেই যেন ধনী গদাধরের কাছে আবদারটি পেশ করেছিলেন যে তাঁর উপনয়নে তিনিই প্রথম ভিক্ষা দেবেন।

আমাদের অনুমানের পিছনে যে-যুক্তিগ্রাহ্য কারণটি তুলে ধরা যায় তা হল : তৎকালের অজ পল্লীগ্রামের সমাজব্যবস্থায় যেখানে নিম্নবর্ণের মানুষদের হাতের জলও ব্রাহ্মণ পরিবারের পক্ষে অস্পৃশ্য গণ্য হত, সেই সমাজে দাঁড়িয়ে ধনীর মতো এমন নিম্নবর্ণের এক বিধবা দরিদ্রা রমণী ক্ষুদিরামের মতো অতি রক্ষণশীল, অপরিগ্রাহী এক ব্রাহ্মণের পুত্রকে উপনয়নের মতো পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রথম ভিক্ষাদানের দুঃসাহসটি কী করে দেখালেন? দ্বিতীয়ত, ক্ষুদিরাম তৎকালে জীবিত না থাকলেও ওই পরিবারের অন্যান্যরা, বিশেষ করে তাঁর প্রিয়সখী চন্দ্রমণি কতখানি বিব্রত হবেন ধনীর ওই ব্যতিক্রমী আবেদনে বা তাঁদের মধ্যে কী যন্ত্রণাময় প্রতিক্রিয়া হবে তাও কি ধনী ভাবলেন না! কিন্তু এখানে আমরা গদাধরের ঈশ্বরত্বের যাচাইকরণে ধনীর এই ইচ্ছার প্রকাশকে একধরনের চ্যালেঞ্জ বলেই মান্যতা দেব। এবং আমরা এও দেখলাম বালক গদাধর ধনীর এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করলেন ও সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। গুরুজনদের অনেক অনুনয় বা বিরোধী যুক্তি প্রদর্শন শাস্ত্রীয় অনাচারের পক্ষে—সবই বৃথা হল। বরং গদাধর দৃঢ় সংকল্পে জানালেন, বেশি বাধা দিলে, অর্থাৎ ধনীর হাত থেকে ভিক্ষা গ্রহণে বিরত করার চেষ্টা করলে, তিনি উপবীতই গ্রহণ করবেন না। আরও জানালেন যে ধনীকে তিনি কথা দিয়েছেন তাঁর হাত থেকেই প্রথম ভিক্ষা নেবেন, তা যদি না রাখতে পারেন তবে তাঁর সত্যরক্ষা হবে না, আর সত্যকেই যদি ছেড়ে দিতে হয় তবে তাঁর ব্রাহ্মণত্ব গ্রহণেরও অধিকার থাকবে না উপনয়নের মাধ্যমে। তিনি তাঁর পিতার সত্যরক্ষার্থে নিদারুণ দুঃখবরণের কথা শুনেছেন। এমন পিতার সন্তান হয়ে তিনি সত্যের অপলাপ কী করে ঘটাবেন! এমন ভাবনাও নিশ্চয়ই তাঁর মনে উঠেছিল।

আমাদের মনে আরও একটি প্রশ্ন ওঠে। পিতার মৃত্যুর পর যে-ছেলেটি মাতা ও ভ্রাতাদের অনুমতি সাপেক্ষেই সব কাজ করেছে, সে কেন এই ব্যাপারে তাঁদের না জানিয়েই এমন একটি চিরাচরিত প্রথা ভঙ্গের কাজটি অনুমোদন করল। পরে ধনী হয়তো ওই কাজটি থেকে নিবৃত্ত হত যদি গদাধরও তাতে সায় না দিত। কিন্তু ব্রাহ্মণবটু সেদিকে অগ্রসরই হল না। আত্মীয়স্বজন ও সমাজে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে গিয়েই ধরে বসল, ধনীকে ভিক্ষামাতা রূপে বরণ করবে। ধনীর স্নেহ ও ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে ও তাঁর হৃদয়ের অভিলাষ জানতে পেরেই বালক সামাজিক শাসনের কথা ভুলে এ-কাজ করেছিল—একথা নিঃসংসয়ে বলা যায়। এই ঘটনাটি আমাদের ভাবতে বাধ্য করছে যে গদাধর যেন তাঁর ঈশ্বরত্ব যাচাইয়ে ধনীর এই চালটিকে সসম্মানে স্বীকার করে নিয়ে তাঁকেও প্রকৃত ভক্তের যথাযোগ্য সম্মানে ভূষিত করে দিলেন। বাহ্যদৃষ্টিতে এটি একটি ছোট ছেলের জেদের ঘটনা বলে প্রচারিত হলেও, ধনী এবং গদাধরও বুঝলেন উভয়ে উভয়ের মনের ভাব। এই ঘটনা অবলম্বনে ধর্মজগতে এই সত্যও প্রতিষ্ঠিত হল যে : (১) আমাদের যে-প্রচলিত সমাজবিধি তা মনুষ্যকৃত, তা অলঙ্ঘনীয় নয়, যদি তা মানবধর্মের বিপ্রতীপে দাঁড়ায় তবে তাকে অতিক্রম করতে হবে। সত্যপরায়ণতা মানবধর্মেরই অন্তর্গত এবং তা সদাই কল্যাণকর। এবং (২) ভগবান অভিমানহীন শুদ্ধাভক্তির অধীন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, ''সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি

চ যাচতে।/ অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥"—যে একবারও আমার শরণাগত হয়ে 'আমি তোমার' একথা বলে, তাকে আমি সর্বভূত হতে অভয়দান করি—এই আমার ব্রত। ক্ষুদিরামপুত্র গদাধর, যিনি দৈবশক্তি নিয়েই জন্মেছেন, তিনিও ভক্ত ধনীর মনোবাসনা বুঝেই তাঁকে কৃপা করতে উদ্যত হয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার্থিব জীবনলীলায় ধনী কামারনির অংশগ্রহণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক; তাঁর ভূমিকাটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ধনী যদি তাঁর ভিক্ষাদান বিষয়ে গদাধরের কাছে কাতর আবেদনটি না রাখতেন, তবে বালক তাঁর উপনয়নে এমন একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিতেন না; সেক্ষেত্রে তাঁর ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে এমন মৌলিক ধারণাটিও জগৎসমক্ষে প্রকাশিত হতে পারত না এবং সমাজমানসিকতায় কোনও পরিবর্তনের ভাবনাও কারও মনে উদিত হত না। ওই অল্পবয়সেই গদাধরের চারিত্রিক দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা, বিচারশীলতা ও মানবধর্ম প্রকাশে ধনীর ভূমিকা একমাত্রিক হয়েই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে অক্ষয়কুমার সেন ওই ভাবময় লীলা অনবদ্যভাবে ছন্দোবদ্ধ করেছেন :

''কেবা ধনী কামারিণী নন্দরাণী প্রায়;
অদ্ভুত রমণী দেখি প্রভুর লীলায়।
মহাভাগ্যবতী, ধরাতলে বিদ্যমান,
বুঝিনা বুঝিনা কেবা তোমার সমান!
কড়ে রাঁড়ী অপুত্রক, ধনী কামারিণী,
না বিইয়ে হইল এবে রামের জননী।
ভক্ত প্রিয় প্রভুদেব, ভক্ত তাঁর প্রাণ
ভক্তি জোরে, ভক্তে করে, তাঁহারে সন্তান।...
মরি কি সৌভাগ্য তব ধনী কামারিণী,
ভিক্ষা দিলে তায়, বিশ্বে ভিক্ষা দেন যিনি...
হেথায় গদাই কন ধনী কামারিণী
ভিক্ষা যদি দেয় তবে ভিক্ষা লব আমি
কখনো না লব ভিক্ষা অপরের হাতে
না হয় না হবে পৈতা, ক্ষতি নেই তাতে॥"

রানি রাসমণি (১৭৯৩-১৮৬১) সম্বন্ধে বলা যেতে পারে, জীবনের প্রারম্ভে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের দেবভাব প্রকাশে ধনী সহায়তা করেছিলেন, তেমনই পরবর্তীতে তাঁর প্রকৃত অধ্যাত্মজীবন গঠন, তাঁর চর্চা বা তপস্যায় পরোক্ষভাবে সহায়তা করতে যেন রানি রাসমণির দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভাব হয়েছিল কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সেখানে মাতৃপ্রতিমায় পূজা করে রামকৃষ্ণদেব তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ করেন; সেই পবিত্র গঙ্গাতীরস্থ ক্ষেত্রেই দিবারাত্র গভীর মনন ও নিদিধ্যাসনে দ্বৈত উপলব্ধি থেকে তাঁর অদ্বৈত ব্রহ্মচৈতন্যে উত্তরণ সম্ভব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের যুগপ্লাবী বার্তা ঘোষণারও উপযুক্ত ভূমিটি নিজের অগোচরেই রচনা করে দিয়েছেন রানি—একসঙ্গে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের উপাসিত দেবতাত্রয়কে একত্রে স্থান দিয়ে—যা তৎকালে বিরোধাত্মক বলেই মনে করা হত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি স্থির নিশ্চিন্ত আবাসস্থান ও তাঁর সাধনার জন্য এমন একটি পবিত্র ক্ষেত্র নির্মাণে রানির উদ্যোগ—যদিও তা মহামায়ার নির্দেশেই—তবুও একটি পরোক্ষ সহায়তা হিসাবেই গণ্য হওয়ার যোগ্য।

রানির পিতৃবংশ ছিল বৈষ্ণবভাবাপন্ন। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের উপাসিকা ছিলেন, পরে শ্বশুরবাড়িতে পূজিত শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনায় ব্রতী হন। তখন ব্রিটিশদের একচ্ছত্র আধিপত্য। বিবাহের কয়েক বছর পর চারটি কন্যাসন্তান জন্মাবার পরেই তাঁর স্বামী সহসা পরলোকগমন করেন। শোক সংবরণ করে ভগবৎ-শরণাগতি নিয়ে তিনি স্বামীর বিশাল এস্টেটের মালিক হন ও অতি দক্ষতার সঙ্গে প্রশাসনিক কার্যকলাপ পরিচালনা করেন। তিনি অতীব বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণ, বিচারশীল ও

ঐকান্তিকভাবে ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। তাঁর নিজের জমিদারিতে ইংরেজদের আধিপত্যখর্বে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন ও দরিদ্র প্রজাদের স্বার্থরক্ষায় সদা সচেষ্ট থেকে সর্বজনের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জনে সক্ষম হন। তাঁর জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস সর্বদাই তাঁর পাশে থেকে তাঁকে সময়োচিত পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন। ইনিই পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম ও প্রধান 'রসদ্দার' হওয়ার যোগ্যতা ও সৌভাগ্য অর্জন করেন ও তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রত্যক্ষ পরিচয়লাভে কৃতকৃতার্থ হন। জনশ্রুতি আছে যে রাসমণি প্রথমে মা কালীর ভক্ত ছিলেন না, পরে একদিন ইংরেজ সেনা তাঁর গৃহ আক্রমণ করলে তিনি একাকী একটি খড়্গহাতে অসীম সাহসের সঙ্গে যেন দৈবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে তাদের প্রতিহত করেন। সেই প্রলয়ংকরী মূর্তি দেখে তারা ভীত হয়ে পলায়ন করে। তারপর থেকেই রানি মা কালীর প্রতি ভক্তিবিশ্বাসসম্পন্ন হন। জনশ্রুতি যাইহোক, রানি রাসমণিকে আমরা রানি লক্ষ্মীবাঈ, রানি ভবানী, রানি অহল্যাবাঈ, রানি দুর্গাবতীর মতন বীর, ব্যক্তিত্বময়ী নারীদের উত্তরসূরি বলেও গ্রহণ করতে পারি।

রানি রাসমণির বৃহত্তম কীর্তি দক্ষিণেশ্বরে মা কালী বা ভবতারিণীর মন্দির স্থাপন যা যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধানতম লীলাস্থানরূপে জগতের ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করে। রাসমণি যেন জহুরির দৃষ্টি নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত গদাধরকে চিনেছিলেন খুব ভাল আধাররূপে।

সমাজবিধি অনুসারে নিম্নজাতীয়া রানি দেবতার ভোগরাগ বা পূজাদির ব্যবস্থা করতে পারেন না। এজন্য রানি শাস্ত্রনির্দেশ জানতে উপযুক্ত পণ্ডিতের অনুসন্ধান করায় শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার বিধান দেন, দেবালয় কোনও ব্রাহ্মণের নামে দানপত্র লিখে দেবোত্তর করে দিলে আর কোনও ব্রাহ্মণের পক্ষে পূজা-ভোগনিবেদনে বাধা থাকবে না। রানি তাই রামকুমারকেই পূজার ভার নিতে অনুরোধ করেন; তিনিও কলকাতার টোল ছেড়ে কালীমন্দিরে চলে আসেন। সেই সূত্রে তাঁর ছোট ভাই শ্রীরামকৃষ্ণও কালীমন্দিরে পরিচিতি লাভ করেন এবং কিছুকাল পর মথুরবাবু ও রাসমণির প্রবল ইচ্ছায় মা কালীর পূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এই সময়েই একদিন গোবিন্দজীর মূর্তিটি নিয়ে পুরোহিত পড়ে যান ও বিগ্রহের একটি পা ভেঙে যায়। অনেকে বললেন, ভগ্ন বিগ্রহে পূজা হতে পারে না এবং নির্দেশ দিলেন মূর্তিটি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে নতুন মূর্তি স্থাপন করে পূজা করতে হবে। রানি ও মথুরবাবু একথা শুনলেন কিন্তু তাঁদের উভয়েরই মনে হল রামকৃষ্ণদেবের মতটিও জানলে ভাল। ঠাকুর জিজ্ঞাসিত হয়ে এ-ব্যাপারে অতি সহজ সমাধান জানালেন একটি যুক্তিনিষ্ঠ উপমা সহযোগে যে—রানির জামাইদের কারও পা ভেঙে গেলে তাকে কি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে নতুন জামাই আনা হবে, না তাকেই সুস্থ করে তোলার ব্যবস্থা হবে? রানি ও মথুরবাবু এমন অপূর্ব দরদি যুক্তিপূর্ণ সমাধানে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং তাঁকেই মূর্তিটি ঠিক করে দেওয়ার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। পরে তাতেই পূজা হতে লাগল। ধনীকে ভিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছিল, এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। মন্দির কর্তৃপক্ষও বিগ্রহসেবা বিষয়ে একটি নতুন আলোক পেলেন যে, চিরাচরিত কতকগুলি প্রাণহীন বিধিনিষেধই ভগবানের সেবাপূজা বিষয়ে শেষকথা নয়। ভগবান আমাদের অতিপ্রিয় আপনার জন, পরমাত্মীয়, তাঁর সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপনেই পূজার সার্থকতা। এই সময় থেকেই রামকৃষ্ণদেব, অতি তেজস্বিনী ও ব্যক্তিত্বময়ী রানি ও তাঁর শিক্ষিত বুদ্ধিমান জামাতার কাছে প্রশ্নহীন যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন।

আরও একটি ঘটনা ঘটল। রাসমণি একদিন কালীমন্দিরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজাশেষে একটি মাতৃসংগীত শোনাতে অনুরোধ করলেন। ঠাকুর তন্ময় হয়ে যখন গানটি করছেন, রানি তখন একটি বিষয়সংক্রান্ত জটিল মামলা বিষয়ে চিন্তাক্রান্ত হয়ে পড়লেন ও সংগীত থেকে তাঁর মনোযোগ সরে গেল। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সেই ভাব ধরতে পারলেন ও সঙ্গে সঙ্গে রানির কোমল অঙ্গে মৃদু করাঘাত করে বলে উঠলেন, ''এখানেও ওই চিন্তা!'' রানি বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে এই ছোট ছেলেটির কাছে মনে মনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত বোধ করলেন এইভাবে ধরা পড়ায়। রানি এবার ছোট ভটচাযের বুদ্ধির পরিচয় নয়, তাঁর অধ্যাত্মশক্তির, দৈবশক্তির পরিচয় পেয়ে ধন্য হলেন। লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজী জানিয়েছেন, এই ঘটনায় ঠাকুরের প্রতি রানির ভক্তি বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' গ্রন্থে স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখেছেন, ''রানীর নিজমনে সাধনাসম্ভূত অতি উচ্চ ভক্তিভাব না থাকিলে ঠাকুরের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা সেদিন ধূলিসাৎ হইয়া যাইত।''

ধনী কামারনির কিন্তু কোনও সাধনার কথা শোনা যায়নি বা তাঁর ঈশ্বরভক্তির কথাও জানা যায় না। পূর্বজন্মের কোনও তপস্যা বা সুকৃতির বলেই তিনি ভগবানের নররূপের প্রতি বাৎসল্যভাবের প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন অথবা অমন সরল, পবিত্র স্বভাবটি পেয়েছিলেন যার জন্য তিনি দৈবীস্বভাবা চন্দ্রমণি—যাঁর গর্ভে অবতারপুরুষ এসেছিলেন—তাঁর সখ্য লাভ করতে পেরেছিলেন। সাধারণ ধাত্রীমাতারা অর্থের বা বস্তুর বিনিময়েই সন্তানের জন্মসময়ে জননীকে সাহায্য করে থাকে, পরে আর তাদের সঙ্গে তেমন কোনও সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু ধনীর পূর্ব থেকেই চন্দ্রমণি দেবীর সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল; তার ভিত্তিতেই তিনি শিশুর জন্মক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছেন ও পরেও তাকে কোলে পিঠে করে আদরযত্নের সুযোগ পেয়েছেন।

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার অনুরূপ বলেই চিন্তা করা যায়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের যে-বাৎসল্যপ্রেম ও মাধুর্যভাব, কামারপুকুরে শিশু ও কিশোর গদাধরের প্রতি পল্লীবাসিনীদেরও যেন ঠিক সেই আচরণ ও ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। ধনীও তাঁদেরই একজন, তাই তাঁর মধ্যেও সেই কোমল মধুর বাৎসল্যভাবের প্রকাশ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসবধের জন্য মথুরায় গেলেন, সেখানে তাঁর ঐশ্বর্য ও বীর্যভাবের প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণও যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন, রানি ও মথুরবাবুর সহায়তায় সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে দিব্যশক্তির বিকাশসাধনে তৎপর হয়ে যেন ঐশ্বর্য ও বীর্যভাবে আরূঢ় হয়ে কলকাতার মোহগ্রস্ত ও ধর্মসম্বন্ধে সংশয়ান্বিত ব্যক্তিদের প্রকৃত ধর্ম সম্বন্ধে চৈতন্য সম্পাদনে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন ও জয়লাভ করলেন। এ তো কংসবধেরই অনুরূপ। স্বামীজী তাঁর স্তবে লিখেছেন, 'সংশয়-রাক্ষসনাশমহাস্ত্রম্'। এখানে রানি তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিলেন তাঁর সম্পদ, ব্যক্তিত্বের প্রভায়, যেমন কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ মথুরার রাজন্যবর্গের মধ্যে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদেরই বাহ্যিক আনুকূল্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবননাট্যে ধনী ও রানি যেন পরস্পরের পরিপূরকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোরলীলায় ধনীর ও পরে অধ্যাত্মজীবনের পরিণতি ও প্রতিষ্ঠায় রানির পরোক্ষ সাহায্যদান তাঁদের উভয়কেই মহিমান্বিত করেছে। ধনী কামারনি সাধন ব্যতিরেকেই ভগবানের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়েছেন, আর রানি রাসমণি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং জানিয়েছেন যে তিনি দেবী দুর্গার অষ্টসখীর একজন ছিলেন। উভয়ের প্রতি রইল আমার বিনম্র সভক্তি প্রণাম।